HISH

1st Paper

Uni-II

1. In what respects, the economic, political, social and religious life of the later Vedic period differed from that of the early Vedic period?

:- হিন্দুদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ হল বেদ। ঋক, সাম, যজু, ও অথর্ব এই চারটি বেদ নিয়ে বৈদিক সাহিত্য গড়ে উঠে। যে যুগে বেদগুলি রচিত হয় ভারতীয় ইতিহাসে তা "বৈদিক যুগ" নামে অভিহিত করা হয়। ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ 'বৈদিক যুগ'কে "পূর্ববর্তী বৈদিক যুগ" এবং "পরবর্তী বৈদিক যুগ' – এই দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। সমাজ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে উভয় যুগের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এগুলি সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে।

সমাজ (Social Condition of the Rig Vedic Age)

ঋক্‌বৈদিক যুগের সমাজ

পিতৃতান্ত্রিক যৌথ পরিবার প্রথাকে ভিত্তি করেই ঋক্‌বৈদিক যুগের সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। পরিবারকে বলা হত 'কুল' এবং পরিবারের প্রধান বা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ সদস্যকে "গৃহপতি" বলা হতো। পরিবার ছিল একান্নবর্তী। একান্নবর্তী পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সকল কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল। কর্তার এই কর্তৃত্ব আর্যদের সামাজিক জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সমাজে বিবাহকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সমাজে পুরুষের প্রাধান্য সত্ত্বেও 'বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল। এক বিবাহকে স্বাভাবিক রীতি বলে সকলেই পুত্রসন্তান কামনা করত। সমাজ পিতৃতান্ত্রিক হওয়ায় সকলেই পুত্রসন্তান কামনা করত।

এ যুগে সমাজে নারীদের স্থান ছিল উচ্চে। ঋগ্বেদে ঘোষা, অপালা, বিশ্ববারা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে। সংসারে নারী ছিলেন সর্বময় কর্ত্রী। পিতৃগৃহে থাকাকালীন নারীদের শিক্ষার সুযোগ ছিল। সমাজে বাল্যবিবাহ অগ্রাহ্য ছিল। পুরুষ ও নারী পরস্পরকে মনোনীত করার পর পিতামাতা বিবাহ স্থির করতেন। তৎকালীন সমাজে নারীদের মধ্যে পর্দাপ্রথার প্রচলন ছিল না। প্রাচীন বৈদিকযুগে বিধবাবিবাহের প্রচলন ছিল। সতীদাহ প্রথা সম্ভবত ছিল না। তবে আর্যদের চোখে নারী সর্বদা পুরুষের অভিভাবকত্বে অধীন ছিলেন। এছাড়া এযুগে নারীরা যুদ্ধবিদ্যা ও শাস্ত্রের চর্চাও করতেন।

বৈদিক যুগে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই সুতি ও পশমের বস্ত্র ব্যবহার করতেন। নারীরা সোনা, রূপো ও দামী পাথরের অলঙ্কার ব্যবহার করতেন। মেয়েরা নানাভাবে কেশবিন্যাস করতেন।

খাবারের তালিকায় ছিল চাল, যব, ফলমূল, সব্জি, মাছ, দুধ ও দুধের তৈরী খাবার, পানীয় হিসাবে সুরা ও সোমরসের বহুল প্রচলিত ছিল।

অবসর বিনোদনের জন্য নাচ-গান, মুষ্টিযুদ্ধ, পাশাখেলা, মৃগয়া, রথের দৌড় প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। এছাড়া বীনা, দুন্দুভি, বাঁশি, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রেরও উল্লেখ রয়েছে ঋগ্বেদে।

ঋক্‌বৈদিক যুগে বর্ণপ্রথা প্রচলিত থাকলেও জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল না। তবে বর্ণব্যবস্থা বংশানুক্রমিক ছিল না। বর্ণ ছিল পেশাভিত্তিক এবং পরিবর্তনীয়।

পরবর্তী বৈদিক যুগের শেষপাদে আর্যসমাজে চতুরাশ্রম প্রথার উদ্ভব ঘটে। প্রত্যেক আর্যসন্তানের জীবনে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস নামে চারটি স্তর বা ভাগ বিভক্ত ছিল। প্রথমস্তরে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বিদ্যাচর্চা করতে হতো এ গুরুগৃহে। গুরুগৃহে শিক্ষা শেষ হলে সংসার ধর্ম পালনকে গার্হস্থ্যাশ্রম বলা হতো। প্রৌঢ় অবস্থায় সাংসারিক দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হলে বানপ্রস্থাশ্রম। শেষ পর্যায়ে সংসারের সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসীর মত জীবনযাপন করার পর্যায়কে বলা হতো সন্ন্যাসাশ্রম।

পরবর্তী বৈদিক যুগের সামাজিক অবস্থা

সামাজিক দিক থেকে পূর্ববর্তী বৈদিক যুগ এবং পরবর্তী বৈদিক যুগের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী বৈদিক যুগে বর্ণভেদের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাজন দেখা যায়। সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বংশানুক্রমিক বৃত্তিকে কেন্দ্র করে বর্ণভেদ তীব্রতর হয়। এ সময়ে বৈশ্যদের মর্যাদা হ্রাস পায়। শূদ্রদেরকে সমাজের দাস বলে মনে করা হয়। তবে এ সময়ে জাতিভেদ বা বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠিত থাকলেও অস্পৃশ্যতা সমাজকে গ্রাস করতে পারেনি।

পরবর্তী বৈদিক যুগে নারীরা পূর্বের মর্যাদা থেকে বহুলাংশে বঞ্চিত হয়। এই সময় পুরুষদের মধ্যে বহুবিবাহের প্রচলন হয়। নারীদের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং বাল্যবিবাহ ও পণপ্রথা চালু হয়।

এই সময়ে শিক্ষা কেবলমাত্র উচ্চপর্যায়ের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। চতুরাশ্রম প্রথা শিক্ষার সাথে পালন করা হতো। শিক্ষার পাঠ্যবস্তু ছিল পবিত্র বেদ, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র।

খাদ্যবস্তু ও পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এযুগে ভাতই প্রধান খাদ্যে পরিণত হয়। মাংস খাওয়ার প্রচলন কমে যায় এবং গো-মাংস আহার প্রায় নিষিদ্ধ হয়ে পড়ে। সোমরস ও সুরা পান পূর্বের ন্যায়ই প্রচলিত ছিল। পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে কার্পাস বস্ত্রের সাথে পশমের বস্ত্র ব্যবহৃত হয়।

পরবৈদিক যুগের রাজনৈতিক জীবন

পরিবারকে ভিত্তি করে যেমন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তেমনি পরিবারকে নিয়েই রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে উঠে। পরিবারকে বলা হত 'কুল' এবং কুলের প্রধান হলেন 'কুলপতি'। কয়েকটি পরিবারকে নিয়ে গঠিত হয় গ্রাম এবং গ্রামের যিনি প্রধান তাকে বলা হয় "গ্রামনী"। কয়েকটি গ্রামকে একত্রিত করে গঠিত হয় "বিশ" এবং তার প্রধানকে বলা হত "বিশপতি"।

এযুগে রাষ্ট্রগুলির আয়তন ছিল ছোট কিন্তু কালক্রমে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রাচীন যুগে রাজার ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। রাজা বংশানুক্রমিকভাবে রাজ্যশাসন করতেন। তবে ক্ষেত্র বিশেষ রাজাকে নির্বাচনের ব্যবস্থাও ছিল। এছাড়া কোথাও কোথাও 'গণ' বা প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উল্লেখও রয়েছে।

রাজশাসনের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সংগঠনের উল্লেখ পাওয়া যায়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজা পুরোহিত, সেনানী, গ্রামণী, গ্রামনী প্রমুখ ব্যক্তিদের দ্বারা রাজ্য শাসন করতেন। রাজার কর্তৃত্বকে "সভা" ও "সমিতি"

মধ্যে ২টি প্রতিষ্ঠান সাহায্য করত। এই যুগে সমিতির ছিল সর্বোচ্চ। রাজা সমিতির নির্দেশ মতোই শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। রাজশক্তি নিয়ন্ত্রণে পুরোহিতের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পুরোহিত সম্প্রদায়ের সহায়তায় তিনি ধর্মের অনুসারে রাজ্য শাসন করতে বাধ্য থাকতেন।

বৈদিক সমাজে রাজা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। রাজার প্রধান দায়িত্ব ছিল আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত শত্রুর হাত থেকে প্রজাদের প্রাণ ও সম্পত্তি এবং রাজ্যের সম্পত্তি রক্ষা ও বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ বন্ধ রাখা। এ যুগে কোন স্থায়ী সেনাবাহিনী ছিল না। পদাতিক, অশ্বারোহী ও রথারোহী বাহিনী ছিল সেনাবাহিনীর তিনটি ভাগ। যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে তির-ধনুক, বল্লম, তলোয়ার, কুঠার, ঢাল, বর্ম, শিরস্ত্রাণ ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। যুদ্ধাস্ত্র ছিল লৌহনির্মিত। ঋগ্বৈদিক যুগে নিয়মিত করব্যবস্থা ছিল না। রাজার আয়ের মূল উৎস ছিল "বলি"। 'বলি' কোন কর ছিল না; দান, প্রণামী বা উপহার ছিল যা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় পাঠানো হত।

পরবর্তী বৈদিক যুগের রাজনৈতিক জীবন

পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্যদের রাজনৈতিক ক্ষমতার বিস্তার ঘটে। এ সময় ক্ষুদ্র রাজ্যের পাশাপাশি শক্তিশালী বৃহৎ রাজ্যের আবির্ভাব ঘটে। ফলে বেশ কয়েকটি উপজাতি-গোষ্ঠী তাদের পূর্বগৌরব ও গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।

রাজনৈতিক আদর্শের ক্ষেত্রেও এ যুগে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সার্বভৌম শক্তি প্রতিষ্ঠার আদর্শে অশ্বমেধ, রাজসূয় ইত্যাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতে থাকে এবং রাজ্যের অধিপতিগণ সম্রাট, বিরাট, ভোজ, একরাট

ইত্যাদি উপাধি ধারণ করেন। এ থেকে অনুমিত যে রাজার ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে দৈবস্বত্বে বিশ্বাসী রাজতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে।

পূর্ববর্তী বৈদিক যুগ অপেক্ষা এ যুগে রাজা শাসনক্ষেত্রে অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী হন। রাজা দেশের প্রতিনিধি। সুতরাং রাজা অভ্রান্ত এবং কোনরূপ দণ্ড পেতে পারেন না। তা সত্ত্বেও রাজারা প্রজাদের মতামতকে উপেক্ষা করতেন না। সুশাসন পরিচালনা, প্রজার ধন-প্রাণ রক্ষা করা ছিল রাজার কর্তব্য। রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেও এ যুগে রাজকীয় অধিকার নানাপ্রকার বাধা-নিষেধের অধীন ছিল।

রাজ্যগুলির আয়তন বৃদ্ধির ফল হিসাবে নতুন নতুন রাজকর্মচারী পদের সৃষ্টি হতে থাকে। সেগুলি হল সংগ্রহীতা (কোষাধ্যক্ষ), ভাগদুঘ (কর-আদায়কারী), সূত (রাজকীয় শকট) ইত্যাদি। এ যুগে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার সূচনা হয়। ফলে রাজ্যশাসন-ব্যবস্থা অধিকতর সুসংগঠিত হয়।

পরবৈদিক যুগের অর্থনীতি

পরবৈদিক সমাজে আর্যগণ তাদের ভ্রাম্যমান যাযাবর জীবন শেষ করে গ্রামকেন্দ্রিক সমাজে জীবন কাটাতে থাকে। প্রথম অবস্থায় গো-পালন ছিল তাদের প্রধান বৃত্তি। গরু ছিল তাদের সম্পদ ও ঐশ্বর্যের মূল উৎস। উত্তর ভারতের নদীমাতৃক অঞ্চলে বসবাস করায় তারা কৃষির প্রতি আকৃষ্ট হন। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল যব। লোহার ফলাযুক্ত লাঙলের সাহায্যে কৃষিজমিতে চাষ করে ফসল উৎপাদনের

উল্লেখ ঋগ্বেদে রয়েছে।

কৃষি ও পশুপালন ছিল আর্যদের প্রধান জীবিকা, তাদের সম্পদকে বলা হয় গোধন। এ যুগে কোনো দ্রব্যের মূল্য গরুর দামে স্থির করা হত। গরু ছাড়া ও ঘোড়া, ভেড়া প্রভৃতি পশুও পালন করা হত।

কৃষিকার্যের উন্নতির সাথে সাথে নানারকম কারুশিল্পেরও উন্নতি ঘটে। সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর জন্য নানা বৃত্তির উদ্ভব ঘটে। কামার, কুমার, সূত্রধর, চামার, রথনির্মাতা প্রভৃতি বৃত্তিধারীদের আবির্ভাব ঘটে। এ যুগে সম্ভবত মুদ্রার প্রচলন ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্য বিনিময় প্রথার উপর ভিত্তি করেই চলত। তবে এ যুগে 'মনা' নামক এক প্রকার মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। 'মনা' ছিল প্রাচীন ব্যাবিলনের মুদ্রা। এ থেকে অনুমান যে পশ্চিম এশিয়ার সাথে আর্যদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের উপলক্ষে দূরে বণিকদের সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ রয়েছে এ যুগে।

কার্পাসবস্ত্র বয়ন ও পশমবস্ত্র বয়ন ছিল এ যুগের প্রধান শিল্প। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই এ কাজে নিযুক্ত থাকত।

পরবর্তী বৈদিক যুগের অর্থনৈতিক জীবন

পরবর্তী বৈদিক যুগে সমাজ গ্রামকেন্দ্রিক ও নগরকেন্দ্রিক এই দুইভাগে বিভক্ত হতে থাকে। কৃষি জনগণের প্রধান উপজীবিকা পরিগণিত হয়। কৃষিকাজে নানা উন্নতি ঘটে। কৃষিক্ষেত্রে লাঙল, বলদ, নানা ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এ যুগে সার ব্যবহার ও উন্নত বীজ বপন শুরু হয়। ফলে কৃষি জমির পরিমাণও বৃদ্ধি পায় এবং শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। গম, ধান ও যব ছিল প্রধান শস্য।

এযুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে উন্নতি ঘটে। পূর্বদিকে বিহার ও বেঙ্গল থেকে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত ব্যাপক বাণিজ্য চলত। এসময় দ্রব্যের দাম নির্ধারণের জন্য "নিষ্ক" নামক একপ্রকার মুদ্রার প্রচলন দেখা যায়। বাণিজ্য বিস্তারের সাথে সাথে বণিকশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার্থে বণিকশ্রেণী অর্থ দাদন দিতে থাকে। ফলে সমাজে অর্থপ্রদানকারী একশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। সমাজে কৃষিকাজ বৃত্তির সাথে সাথে পুরোহিত, ধনুক নির্মাতা, পশুবিক্রেতা, নদী পারাপারকারী প্রভৃতি বৃত্তিধারী মানুষ সমাজে দেখা যায়।

পরবর্তবৈদিক যুগের ধর্মজীবন

ভারতীয় সমাজ মূলতঃ ধর্মাশ্রয়ী, বেদের বিভিন্ন স্তোত্র থেকে আর্যদের ধর্মজীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তবৈদিক যুগে আর্যরা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেবতা রূপে পূজো করত। তারা সর্বপ্রাণবাদ অর্থাৎ পৃথিবীর সকলবস্তু — এমনকি প্রকৃতির জড় ও প্রাণীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। ওই তাদের সম্পর্ক রাখার জন্য বৈদিক আর্যরা এ প্রাকৃতিক শক্তির উপর থেকে আপনাদের সাহায্যে, পূজো-অর্চনা করত। আর্যদের উপাস্য দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, সোম উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তবৈদিক যুগে প্রধান দেবতার প্রাধান্য লক্ষণীয়। ঋগ্বেদে বহুদেবতার উল্লেখ থাকলেও আর্যরা মূলত ছিল একেশ্বরবাদী। কারণ বেদের স্তোত্রগুলি

প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী হিসেবে সম্মান করে।

আমাদের মনে হয় "দ্যৌঃ" ছিল আকাশের দেবতা বা পিতা আর পৃথিবী ছিল মাতা। খাদ্য, জল, বাসস্থান দিয়ে এরা জীবজগতকে রক্ষা করেছেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

ইন্দ্র ছিলেন ঋকবৈদিক আর্যদের প্রধান উপাস্য দেবতা। তিনি ছিলেন বজ্রের ও বৃষ্টির দেবতা। তিনি বজ্রের দ্বারা অসুর বা দৈত্যদের পরাজিত করতেন এবং বৃষ্টিপাতের দ্বারা শস্য উৎপাদন করাতেন। ঋকবেদে তাকে "পুরন্দর" বা পুর বা দুর্গ ধ্বংসকারী বলে বর্ণনা করা হয়। তার অপর নাম বৃত্রঘ্ন ছিল।

ইন্দ্রের পরেই অগ্নির স্থান। অগ্নিকে দেবতা ও মানুষের মিলনের সেতু ছিল সংযোগরক্ষাকারী দেবতা বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু সে ছিল যজ্ঞের সময় অগ্নিতে যে সব দ্রব্যাদি উৎসর্গ করা হয় তা বায়ুভূত হয়ে ধোঁয়ার আকারে দেবতার কাছে পৌঁছায়।

বরুণ ছিল পাপ-পুণ্যের বিচারক ও রক্ষক। তাছাড়া সূর্য ছিল আলোর দেবতা, যম ছিল মৃত্যুর দেবতা। সাবিত্রী ছিলেন সূর্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী ও প্রাণদাত্রী।

বৈদিক যুগে ধর্মীয় আচরণের প্রধান অঙ্গ ছিল প্রার্থনা, বলিদান ও যাগযজ্ঞ। আর্যরা গোষ্ঠীবদ্ধ বা ব্যক্তিগত-ভাবে দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতেন। দেবতাদের সন্তুষ্ট করতে বলিদান ছিল প্রচলিত রীতি। এছাড়া দেবতাদের সন্তুষ্টি জন্য যাগযজ্ঞের আয়োজন করত। যজ্ঞমন্ত্র পরিচালনা করতেন ব্রাহ্মণরা।

পরবর্তী বৈদিকযুগের ধর্মীয় জীবন

পরবর্তী বৈদিকযুগে আর্যদের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচারের অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। এ যুগে ইন্দ্র-বরুণ প্রভৃতি দেবতার পরিবর্তে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্তারূপে কল্পনা করে সমস্ত কিছুর মূলাধার রূপে গণ্য করা হত। এই সময়ে রুদ্র শিব বা মহাদেব নামে পূজিত হন। এযুগে বিষ্ণু মানুষের রক্ষাকর্তারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ, এ যুগে পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এ যুগে ব্রাহ্মণ্যবাদের ধর্ম-এ অনেক অনার্য আচারের লাভ ঘটেছিল। দেবদেবীর পূজা অর্চনার সাথে সাথে মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাক, ডাকিনীবিদ্যা, যাদু-বিদ্যা, ভূত-প্রেত-পিশাচে, অপদেবতায় বিশ্বাস এবং গাছ, সাপ, পাথর, জীবজন্তু উপাসনা ইত্যাদি এ যুগের আর্যদের ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করে।

এ যুগে দার্শনিক ভাবনার ও চিন্তন কাজেরও প্রসার ঘটে। কর্মফল ও জন্মান্তরবাদের ধারণা এ যুগে বিকশিত হয়। মুক্তির পথে পরমাত্মার সাথে মানবাত্মার মিলন সম্পর্কে ধারণার সৃষ্টি এ সময়ে হয়। আত্মজ্ঞানের পাশাপাশি বস্তুবাদের ধারণাও বস্তুবাদী দর্শন এ যুগে গড়ে উঠে। এই বস্তুবাদের উদ্ভাবক ছিলেন ঋষি উদ্দালক। তিনি ঈশ্বরের পরিবর্তে প্রকৃতিকে এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টির মূল আধার রূপে বর্ণনা করেছেন। এই বস্তুবাদী দর্শন থেকে পরবর্তীকালে দেহবাদী দর্শনের উদ্ভব হয়।